بسم الله الرحمن الرحيم

শিক্ষিত বালক

[মাসিক রহমত কিশোরপাতার গল্প-সংকলন]

সম্পাদনা
মনযূর আহমাদ

চেতনা

চেতনা

শিক্ষিত বালক

(মাসিক রহমত এর গল্প সংকলন)

সম্পাদনা : মনযূর আহমাদ

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
অলংকরণ : ফয়সাল মাহমুদ

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২০ ঈসায়ী
রবিউল আউয়াল : ১৪৪২ হিজরী

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক : চেতনা প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৬২৪১৫০৭০

মুদ্রণ : আফতাব প্রেস, ২৬ তনুগঞ্জ লেন, কাঠেরপুল সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

পরিবেশক : মাকতাবাতুল হিযায, মাকতাবাতুন নূর, পড় প্রকাশ

মূল্য : ২৫০ টাকা

অর্পণ

এক সময় যারা গল্প পড়ে এই গল্প লিখেছিলে
তাদের অনেকে এখন বড় লেখক, বড় আলিম, বড় বিদ্যান, বিদগ্ধজন
এখন যারা এই গল্প পড়বে তারা কি ছোট থাকবে!
তোমরাও বড় হবে, বিখ্যাত হবে, জ্ঞান-গরিমায় সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে
আমাদের এই আকাঙ্ক্ষার মান রাখবে—
সেই আশায় এই বই তোমাদের হাতে তুলে দিলাম-

সম্পাদকের কথা

কেন বই পড়ব এবং কেন এই বই পড়ব?

কেন আমরা বই পড়ব? এর একটা চমৎকার ব্যাখ্যা আছে। ধরুন, কেউ টেলিভিশনে একটা জিনিস দেখে, সেটা টেলিভিশন তাকে সরাসরি দেখায়। এক্ষেত্রে কল্পনার কোনো দখল থাকে না। বিষয়টা সরাসরি দেখা ও দেখানো হচ্ছে। এর বিপরীতে বইয়ে একটা কিছু লেখা থাকে; ধরা যাক বইয়ে লেখা আছে নীল আকাশ। পাঠক কিন্তু বইয়ে নীল আকাশ দেখতে পারছে না। সে নীল আকাশ শব্দটা চোখ দিয়ে পড়ছে। রেটিনা থেকে সেটা তার মগজে যাচ্ছে। মগজ সেটা বিশ্লেষণ করছে। তারপর সে কল্পনা করছে নীল আকাশকে। এই যে প্রক্রিয়াটা, এইটা অত্যন্ত আরাম দায়ক। এই প্রক্রিয়া চালু না থাকলে মেধা সমৃদ্ধ হয় না। সে জন্য যারা শুধু টেলিভিশন দেখে তাদের মাঝে মেধা-সমৃদ্ধির এই প্রক্রিয়াটা সচল হয় না। তার মস্তিষ্কে চিন্তারা ডালপালা ছড়ায় না। তার মস্তিষ্ক অলস পড়ে থাকে। কিন্তু বই পড়লে মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়ে। এটা হলো বই কেন পড়তে হবে তার পক্ষে প্রধানতম কারণ। মস্তিষ্ক কে উন্নত করার জন্য বই পড়া জরুরি।

আর যখন কেউ বই পড়া শিখে যায় তখন তার চিন্তা-চেতনার জগৎ খুলে যায়, অবারিত হয়ে যায়। পৃথিবীতে কত বিচিত্র বিষয়ের ওপরই না বই লেখা হয়েছে। আমরা তো কখনোই গাজালি, ইবনে সিনা, শাহ ওয়ালিউল্লাহর দেখা পাব না; রুমি, সাদি ও ওমর খইয়ামের দেখা পাব না; কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, ফররূখ আহমাদের সাথেও আমাদের দেখা হবে না। আল-মাহমদকেও আর দেখতে পাব না। আলি তানতাবি ও আলি মিয়া নদভিকেও আর দেখতে পাব না।

মাহমুদ দারবিশের সাথেও আর দেখা হবে না। কিন্তু যখন তাদের লেখা বইগুলো পড়ি তখন মনে হয় তারা আমাদের পাশেই আছেন। আমাদের সাথেই আছেন। হুমায়ূন আহমেদ চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর বইগুলো রয়ে গেছে। একজন পাঠক যখন তার বই পড়বেন তখন তিনি নিশ্চয়ই অনুভব করবেন হুমায়ূন আহমেদ তার সাথে কথা বলছেন। তার পাশে বসে আছেন। এই অনুভবটা কিন্তু বিশাল একটা ব্যাপার। কাজেই সবার উচিত বই পড়া। সবচেয়ে বড় কথা ছোটবেলায় একবার বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠলে ছেলে-মেয়েদের জন্য আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। কারণ বই-ই তাকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। ছোটবেলায় বই দেখতে দেখতে ও পড়তে পড়তেই বড় হয়েছি। হুমায়ূন আহমেদ এই যে এতবড় লেখক হয়েছেন তার একটাই কারণ ছিল তিনি অতি অল্প বয়সেই অনেক বেশি বই পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কেউ যখন অনেক বই পড়ে তখন তার চিন্তা-চেতনার জগৎ খুলে যায়। লেখালেখির ক্ষমতা জন্মায়। যারা লেখক হতে চান অবশ্যই তারা বই পড়ুন। এবং গল্পের বই দিয়ে পাঠ শুরু করুন।

পাঠক! এতটুকু পড়ার পর আশাকরি আর বলতে হবে না, কেন বই পড়ব এবং কেন এই বই পড়ব?

দোয়াপ্রার্থী

মনযূর আহমাদ
সাবেক সম্পাদক, মাসিক রহমত।

প্রকাশকের কথা

গল্পগুলো কেবল গল্প নয়

শিশুরা, কিশোররা গল্পপ্রিয়। তারা গল্পের জগতে ডুবে থাকতে চায়। সেই গল্প হতে পারে সত্য কিংবা কাল্পনিক। হতে পারে ইতিহাস কিংবা পৌরানিক। হতে পারে কুরআন-হাদিস-নির্ভর-শিক্ষণীয় গল্প, যা হতে পারে উন্নত জীবন গড়ার আলোকিত পাথেয়। আমরা চাই ছোটরা গল্প পড়ার ভেতর দিয়েও ঈমান শিখুন, ইসলাম শিখুন, দুনিয়া বুঝুক ও উন্নত চরিত্র গঠন করুক। তারা বিগত মহান বিদ্বান ও বীরদের জীবন থেকে বড় ও বীর হওয়ার প্রেরণা অর্জন করুক। আমরা চাই, আগামী প্রজন্ম বিবেকবান, বিনয়ী, উদার, উন্নতনৈতিকতায় সমৃদ্ধ এবং ঈমানে আপোসহীন নাগরিক হিসাবে আপন বলয়ে শিখা প্রজ্জ্বলিত করুক। নিজ জাতি ও উম্মাহর স্বার্থ সুরক্ষায় তারা অতন্দ্রপ্রহরী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা দান করুক।

আমরা 'শিক্ষিত বালক' ও 'রাজার মত দেখতে' সংকলন দুটিতে এমনই কতগুলো গল্প সাজিয়ে আপনাদের সমীপে হাজির করার চেষ্টা করেছি।

এই গল্পগুলো অনেকের আগেই পড়া আছে। এখন সে কথা অনেকে ভুলে যেতেও পারে। গল্পগুলো মুদ্রিত হয়েছেলো মাসিক রহমত এ ২০০১ থেকে ২০১৫ এর মধ্যে। যাদের অনেকে এখন বিখ্যাত শিক্ষক, খতিব, রাজনীতিক ও নামকরা পাঠকপ্রিয় লেখক-গবেষক-আলোচক, সমাজসেবক ও সংগঠক। এদের সেই সময়ের লেখাগুলো পড়ে বর্তমান নবীন পাঠক-প্রজন্ম আশাকরি আলাদা স্বাদ পাবে।

এই গ্রন্থে এমন কতগুলো গল্প আছে যেগুলো ছদ্মনামে লেখা হয়েছে। অনেকের আসল নাম মনে পড়লেও ভুল হতে পারে সেই সন্দেহে সেগুলো ওভাবে রেখে দেয়া হয়েছে। আবার অনেকের নাম উল্লেখ নেই। হয়ত মূল থেকে কম্পোজ করার সময় ভুল করা হয়েছে অথবা নাম উল্লেখই ছিল না। সেগুলো মূলের সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন করার সুযোগও হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। অতএব দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া কীইবা করার আছে!

এখানে আপনি অনেক স্বাদের গদ্য-গল্প পাবেন। বিভিন্ন শৈলীর-বুননে অনেক বিষয় পাবেন এক মলাটের ভেতরে। আশাকরি গল্পগুলো জীবন গঠনে, বড় হওয়ার স্বপ্ন পূরণে ও বুদ্ধির দীপ্তি ছড়াতে বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

স্বত্বাধিকারী, চেতনা প্রকাশন
খুরশিদ আমজাদি।

সূচি

সম্পাদকের কথা
প্রকাশকের কথা

শিক্ষিত বালক- আরশাদ ইকবাল - ১৩
আমি গোলাম নই- আবু মাহমুদ - ২৩
তিন বন্ধু- মুহাম্মদ মোস্তফা আল-হুসাইন - ২৫
সাহসী মানুষ- মনযূরুল হক - ২৭
সবচেয়ে ভালো মানুষ- আয়েশা বিনতে ইসমাঈল বরিশালী - ৩৩
মায়ের মতো মা- আরশাদ ইকবাল - ৩৫
রাত দুপুরে- মোস্তফা জামান - ৩৮
এ খাবার আমার জন্য নয়- আহমাদ জামিল - ৪২
দুর্ধর্ষ বীর- আকরাম ফারুক - ৪৪
একে বলে মানবতা - ৪৭
নিরুত্তর- শহিদুল ইসলাম - ৪৯
মহত্ত্ব- ফারজানা ইয়াসমিন ফাতেমা - ৫২
মোক্ষম দাওয়াই- আব্দুল আজীজ আল-হেলাল - ৫৫
নাইন ইলেভেন ও মেসওয়াক- তাজুল ফাত্তাহ - ৫৭
পুলিশ পালানো- নুরুল ইসলাম বর্দ্দপুরী - ৬২
একেই বলে সৌভাগ্য - ৬৪
ফকির বাদশাহ- আহমাদ আল-ফিরোজী - ৬৭
সম্রাটের স্বপ্ন - ৭১
শেষ চিঠি- মুহাম্মাদ নুরুল আমীন - ৭৪
জান্নাতের স্বাদ - ৭৮
অবিশ্বাস্য - ৮১
খাত্তাব, তোমাকে লাল সালাম- ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী - ৮৪

বুদ্ধিমান কে? - ৯১
শয়ন ও জাগরণ - ৯৩
সুধারণার এক অনুপম দৃষ্টান্ত - ৯৫
কৃতজ্ঞতা বনাম অকৃতজ্ঞতা - ৯৬
নরাধম- এম ইমরান আহমাদ - ৯৯
ছোট শাহজাদা- শিবলী হাসান - ১০২
এক প্রশ্নের দশ উত্তর- এ এইচ আল-আমীন - ১০৪
আনুগত্যের স্বরূপ- মুহাম্মাদ মহিউদ্দিন ফারুকি - ১০৭
ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন- মুহা. জাহিদুর রহমান জাহিদ - ১০৯
বাঁদির আনুগত্য- মুহা. আনোয়ার হোসাইন খান সোহেল - ১১১
চোর ধরার কৌশল- মুহা. আব্দুর রউফ সিদ্দিক - ১১৪
ভয়ংকর পাপ- আহমাদ আল-ফিরোজী - ১১৬
সেই ছড়িটি- ফয়জুল্লাহ আমান - ১২০
ত্যাগের বিনিময়- মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন - ১২৩
বুদ্ধিমান কাজি- বদরে আলম - ১৩১
কথার কৌশল- মুহা. আজিজুল হক - ১৩৩
সমস্যা এড়ানোর কৌশল - মু. আজিজুল হক - ১৩৫
সততার ছবি- মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদুদ - ১৩৬
খোশবু- মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার সিরাজী - ১৩৮
জুতা- নাসর ইবরাহীম। ভাষান্তর : মিরাজ রহমান - ১৪২
সাতজন সৌভাগ্যবান বাহাদুর মুসলিম- আহমাদ আল-ফিরোজী - ১৪৮

শিক্ষিত বালক

১.

অ্যাই ছেলে, আমাদের কি একটু দুধ দেবে? ভীষণ পিপাসা পেয়েছে!

ছেলেটি চমকে উঠে পেছনে তাকায়। দেখে, তার সামনে দু'জন সুপুরুষ দাঁড়ানো। উভয়ের চেহারা আলোয় ঝলমল করছে। মুখ নয়, যেন পূর্ণিমার চাঁদ।

বালক উত্তর দেয়।

বকরি আমার নয়। উকবা বিন আবি মাবাদের। আমি রাখাল। আমার দায়িত্ব শুধু এগুলো দেখাশোনা করার। তার অনুমতি ছাড়া দুধ দেব কীভাবে? এগুলো তো আমানত!

ছোট ছেলের মুখে এমন উত্তর শুনে আগন্তুকদ্বয় অবাক হন, মুগ্ধও হন।

এবার দ্বিতীয় জন বললেন :

ঠিক আছে, তুমি এক কাজ করো, তুমি এমন একটা বকরি নিয়ে এসো, যেটা কখনো দুধ দেয়নি।

এ কথা শুনে রাখাল ছেলে বলল :

এমন বকরি দিয়ে কী করবেন! আপনাদের তো প্রয়োজন দুধের। এমন বকরি আপনাদের কী কাজে আসবে?

আগন্তুক বললেন :

তুমি আনো, দেখা যাক, কোনো কাজে আসে কি না!

রাখাল ছেলে একটি বকরি নিয়ে এল।

আগন্তুকদ্বয়ের একজন হজরত রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আরেকজন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

ইসলামের একদম প্রথম দিকের সময়।

হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হজরত সিদ্দিকে আকবার রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর পর্যন্ত—চলে এসেছেন।

মরুর দেশ!

উত্তপ্ত পরিবেশ!

গরম যেন নয়, অগ্নিবারি বর্ষিত হচ্ছে!

পিপাসায় বুকের ছাতা শুকিয়ে কাঠ!

অল্প একটু পানীয় না হলেই নয়। তাঁরা উভয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। কোথাও পানি নজরে পড়ল না। নজরে পড়ল এক পাল বকরি। আর অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা রাখাল। তাঁরা রাখালের কাছে এলেন এবং বললেন- *অ্যাই ছেলে, আমাদের কি একটু দুধ দেবে? ভীষণ পিপাসা পেয়েছে...!*

২.

রাখাল ছেলে একটা বকরি নিয়ে এল। কিন্তু তার বুঝে আসছিল না, এই বকরি দিয়ে আগন্তুকদ্বয় কী করবে। বকরিটি আজ পর্যন্ত কখনো দুধ দেয়নি। দুধ দেয়ার উপযুক্তও নয়। বাচ্চাই যে দেয়নি এখনো!

কিন্তু কিছুক্ষণ পর রাখাল ছেলে যা দেখল, তাতে সে হতভম্ব! এও কি সম্ভব! সে স্বপ্ন দেখছে না তো!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরির ওলানে হাত বুলালেন এবং দুআ করলেন। সাথে সাথে বকরির ওলান দুধে ভরে গেল। কী অদ্ভুত ব্যাপার!

এবার হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এগিয়ে এলেন। দুধ দোয়ালেন। এ পরিমাণ দুধ হলো, তাঁরা তিন জন যথেষ্ট পরিমাণে পান করলেন এবং পরিতৃপ্ত হলেন।

সুবাহানাল্লাহ!

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার দুআ করলেন।

বকরির ওলান আগের মতো হয়ে গেল।

আল্লাহু আকবার!

আগন্তুকদ্বয়ের আচরণে রাখাল বালক প্রথম থেকেই বিস্মিত ছিল। এবার তার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল, এও কি সম্ভব! এরা কারা!

রাখাল ছেলে বেশ কিছু দিন ধরে শুনছে, মক্কায় নাকি একজন নবীর আবির্ভাব হয়েছে।

সে এক আল্লাহর কথা বলে।

এক আল্লাহর ইবাদত করার কথা বলে।

সে মূর্তির অসারতার কথা বলে।

মূর্তিপূজা ত্যাগ করতে বলে।

তাঁর ধর্মের নাম ইসলাম।

সে সবাইকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলে।

রাখাল ছেলে সেই নবীকে কখনো দেখেনি। কিন্তু তার মনে হলো, এই ব্যক্তিই সেই নবী। যাঁর কথা সে এত দিন শুনছে। যাঁর ধর্মের নাম ইসলাম। যে এক আল্লাহর কথা বলে। এক আল্লাহর ইবাদত করতে বলে।

যে বকরি কখনো দুধ দেয়নি, সেই বকরি কিনা দুধ দিল! হাত বুলালেন, দুআ করলেন—আর ওলান দুধে ভরে গেল! কী অদ্ভুত ব্যাপার! তাও কি একটু-আধটুকু! তিন তিন জন মানুষ তৃপ্তিসহকারে খেলেন।

বিস্ময়ের সাগরে সে হাবুডুবু খেতে থাকে। শত ভেবেও কোনো কূল-কিনারা পায় না।

ঘটনার পুরো সময় সে নীরব ছিল। কিন্তু সিদ্ধান্ত যা নেওয়ার তা নিয়ে ফেলল। সন্ধ্যায় লোকালয়ে ফিরে এল এবং সোজা রাসুলের দরবারে হাজির হলো।

হে আল্লাহর রাসুল! নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ!
আপনি সত্য, আপনার দ্বীন সত্য, আপনার সব সত্য।
দয়া করে আমাকেও আপনি আপনার দলে শরিক করে নিন।
আমাকেও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় দিন।

তাঁর কণ্ঠে আবেগ ছিল, নিষ্ঠা ছিল। ছিল সত্য গ্রহণের অপার ব্যাকুলতা।

রাখাল ছেলেকে দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি হাসলেন। তৃপ্তি ও প্রাপ্তির হাসি। সুখ ও আনন্দের হাসি। ভালোলাগা ও ভালোবাসার হাসি! কী জীবন্ত সে হাসি! যদি তোমরা দেখতে!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালকের সত্যবাদিতা আগেই দেখেছেন। তুলনাহীন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কালেমা পড়ালেন।

চির শান্তির ভুবন-ইসলামের পথ দেখালেন।

হাত বুলালেন মাথায় ভালোবাসার। এবং বললেন—

*তুমি একটি **শিক্ষিত বালক**।*

৩.

এই সৌভাগ্যবান বালক ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

ঈমান গ্রহণ করার পর তিনি নিজেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অর্পণ করেন। নিজেকে তাঁর জন্য ওয়াকফ করেন। সারা দিন রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেন। খেয়াল করে তাঁর কথা শোনেন। তাঁর আমল-আচরণ দেখেন। অনুরূপ চলার চেষ্টা করেন। আনুপুঙ্খ তাঁর নির্দেশ ও নির্দেশনা মান্য করেন।

ইসলামের একদম শুরু লগ্ন। মাত্র কয়েকজন লোক ইসলামের ছায়াতলে ঠাঁই নিয়েছেন।

একদিন তাঁরা সবাই একসাথে বসেছেন। পরামর্শ করলেন, কুরাইশরা আজ পর্যন্ত কারও থেকে উচ্চস্বরে কুরআন পড়া শোনেনি। আমরাও কেউ কখনো উচ্চস্বরে কুরআন পড়িনি। সুতরাং একদিন তাদের সামনে উচ্চস্বরে কুরআন পড়া হোক।

এ কথা শোনার সাথে সাথে হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু বলে উঠলেন—

এ কাজ আমি করব।

হজরত সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে বললেন—

দেখো, কাজটি কিন্তু বিপজ্জনক। মারাত্মক ধরনের সমস্যায় পড়তে পারো। আর তোমাদের গোত্রও তেমন শক্তিশালী নয়। জনবলে অনেক দুর্বল। তারা তোমাকে মুশরিকদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে?

তোমরা আমাকে অনুমতি দিয়েই দেখো!

তাঁর কণ্ঠে প্রত্যয়ের প্রভা ঝরে পড়ে।

আমার রবই আমার ভরসা। তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন। তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন।

আবেগোদ্বলিত কণ্ঠে বললেন হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

৪.

পরের দিন।

সূর্য ওঠার কিছুক্ষণ পর মক্কার মুশরিকরা এক জায়গায় সমবেত হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেখানে গেলেন এবং উচ্চ স্বরে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত শুরু করলেন।

কী মধুর সে তিলাওয়াত!

তাঁর তেলাওয়াত শুনে মুশরিকদের একজন বলল—

এ তো মনে হয় সেই কিতাব পড়ছে, যা মুহাম্মাদের উপর নাজিল হয়েছে!

এ কথা শোনামাত্র মুশরিকরা ক্রোধে জ্বলে উঠল। তাদের চোখ থেকে যেন ছিটকে পড়ছে অগ্নিগোলা। হিংস্র বাঘের মতো আছড়ে পড়ল তারা কিশোর এই সাহাবির উপর। কিল ঘুষি লাথি-যে যেমন পারল, দিল।

থেতলে গেল তার চেহারা।

রক্ত ঝরল তাঁর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে-কেটে ফেটে।

তবু তিনি থামেন না। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত অব্যাহত রাখেন পরম আবেগে।

তিনি পড়ছেন, ওরা মারছে। ওরা মারতে মারতে ক্লান্ত, তিনি তিলাওয়াত করে যাচ্ছেন অবিশ্রান্ত।

কী অবিশ্বাস্য দৃশ্য! গা শিরশির করে উঠে!

কুরআনের জন্য এ কেমন ভালোবাসা! পৃথিবীর আর কোথায় পাবে তুমি এমন প্রেম!

এবার তিনি থামলেন।

তাও কি থামতেন, যদি না সূরা শেষ হত!
হিংস্ররা যখন মার থামাল তখন তাঁর অবস্থা বড়ই করুণ।
ছিঁড়ে গেছে পোশাক।
রক্তাক্ত শরীর।
আলুথালু চুল।
কিন্তু ওষ্ঠাধারে তাঁর বিশ্বজয়ের হাসি। তৃপ্তি।
তিনি ফিরে এলেন সহাবায়ে কেরামের আলোর আসরে। তাঁকে দেখে সাবাই আঁতকে উঠলেন—*এ কী অবস্থা তোমার!*
চোখের পানি বাঁধ ভেঙে নেমে আসে তাঁদের কপোলেও।
এই আশংকা আমরা আগেই করেছিলাম।
হজরত সাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম বললেন।
এ কথা শুনে তিনি আবেগ-উজ্জ্বল প্রত্যয়ের সাথে বললেন—
আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামীকালও তাদের আল্লাহর কালাম শোনাব। যতটুকু করেছ যথেষ্ট হয়েছে। আর দরকার নেই।
হজরত সাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম বললেন।
হজরত সাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম তাঁকে বারণ করলেন এবং বাধ্য করলেন—এমন আর না করতে। তিনি নিবৃত্ত হলেন। নরাধম কাফেরদের আসরে আর গেলেন না।

৫.

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিবৃত্ত হলে কী হবে, নিবৃত্ত হলো না নরকের কীটগুলো। তারা শপথ নিলো তাঁকে শেষ করে দেবে—দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেবে।
শুরু হলো আবার নির্যাতন।
নিক্ষিপ্ত হলো ইট-পাটকেল।
পিঠে পড়ল কিল-ঘুসি-লাথি।
রক্তাক্ত হলো সারা শরীর। গায়ের পোশাকে লাল লাল ছোপ ছোপ রক্ত।
একদিন। দুইদিন। তিনদিন ...
প্রতিদিন ...
প্রতিদিন নির্যাতনের শিকার হতে লাগলেন।
প্রতিদিন পৈশাচিক নির্যাতন সয়েও তিনি অটল অবিচল দ্বীনের উপর।

একটুও নড়াতে পারেনি তাঁকে তাঁর ঈমান থেকে। চিড় ধরাতে পারেনি তাঁর বিশ্বাসে। রক্তাক্ত বদনেও তিনি হাসেন—প্রাপ্তির হাসি-বিজয়ের হাসি।

নির্যাতনের করুণ দৃশ্য দেখেন অসহায় সাহাবায়ে কেরাম। তাঁরাও কাঁদেন। প্রতিশোধ তাঁরাও নিতে পারেন। কিন্তু নেন না। নিষেধ যে আছে রাসুলের। তাই তাঁরা তাঁকে বোঝান। সাহস দেন। সবর করতে বলেন। আর দুআ করেন কাফেরদের জন্য—হে আল্লাহ, তুমি তাদের হিদায়াত দাও। সঠিক বুঝ দাও। দাও আলোকিত পথের সন্ধান।

নির্যাতনের দৃশ্য দেখেন স্বয়ং দয়ার নবীও। তিনিও কাঁদেন। অন্তর তাঁর ছিঁড়ে যায়। কলিজা চুঁয়ে রক্তক্ষরণ হয়। বুকে জড়িয়ে নেন আবদুল্লাহকে পরম ভালোবাসায়।

রাসুল কাঁদেন তাঁর বন্ধুদের দুঃখ দেখে।

আর আবদুল্লাহ হাসেন প্রিয়জনের আদর পেয়ে।

কী অপূর্ব দৃশ্য!

৬.

দয়ার নবী তাঁর নির্যাতনে জর্জরিত বন্ধুকে হিজরতের নির্দেশ দেন।

তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করেন প্রিয়'র নির্দেশ।

তিনি হিজরত করেন। দেশ ত্যাগ করেন। চলে যান দূর দেশ-হাবশায়।

পেছনে রেখে যান জন্মভূমি মক্কা। শিশুবেলার মক্কা। কৈশোরের মক্কা।

স্মৃতিবিজড়িত মক্কা। বাইতুল্লাহর মক্কা। রাসুলুল্লাহর মক্কা।

ছেড়ে যান আপনজন। আত্মীয়স্বজন। বন্ধু-বান্ধব।

এবং প্রিয় রাসুলকে। আলোর আসরকে।

যে মানুষটির জন্য ত্যাগ করলেন ধর্ম।

ত্যাগ করলেন মাতা-পিতা।

ত্যাগ করলেন আপনজন এবং আবাল্য বন্ধুদের ...

নির্যাতন সইলেন। রক্ত ঝরালেন।

আজ কি না সেই প্রিয় মানুষ-আলোর দূত-রাসুলকেই ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে-দূর দেশ-হাবশায়!

এ যে প্রিয়তমের নির্দেশ!

তিনি চলে যান হাবশায়।

প্রিয়জনকে ছেড়ে যাচ্ছেন—প্রিয়জনের নির্দেশে।
আগ-পিছ কোনো ভাবনা নেই। মত নেই। দ্বিমতও নেই।
প্রিয়জন বলেছেন, তা-ই শিরোধার্য।
কী অপূর্ব আনুগত্য। কী অদ্ভূত ভালোবাসা।
এমন উপমাহীন প্রেম তুমি কোথায় পাবে, বন্ধু!

৭.
তিনি হিজরত করেন তিনবার।
প্রথমবার হাবশায়।
দ্বিতীয়বারও হাবশায়।
তৃতীয়বার সোনার মদিনায়।
তৃতীয়বার হিজরত করে যখন তিনি মদিনায় এলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারি সাহাবি হজরত মাআয বিন জাবাল রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তাঁর ভাই বানিয়ে দেন এবং মসজিদে নববির পাশে এক টুকরো জমি দেন। তিনি সেখানেই ঘর তুলে বসবাস শুরু করেন।

৮.
দ্বিতীয় হিজরি।
বদরপ্রান্তর।
বেজে উঠে যুদ্ধের দামামা। শুরু হয় লড়াই।
একদিকে অস্ত্রে সজ্জিত মক্কার কাফেরদের বিশাল দল। অন্যদিকে অস্ত্রহীন মুষ্টিমেয় মুসলিম। শুরু হলো লড়াই। হক বাতিলের লড়াই। সত্য মিথ্যার লড়াই।
মুহূর্তে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠে মক্কার জীবনের সেই দুর্বিষহ স্মৃতি। ভেসে উঠে নরাধম জালেম কাফেরদের হিংস্র মুখাবয়ব। যুদ্ধের ভয়ঙ্কর সময়েও তিনি খুঁজতে থাকেন কাফের সরদার আবু জাহালকে। এই সেই আবু জাহেল, যে স্বয়ং রাসুলে খোদাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিল!
হায়রে নরাধম!
জাহান্নামের কীট।

খুঁজতে খুঁজতে তিনি পেয়েও গেলেন আবু জাহালকে।
কিন্তু ততক্ষণে অন্য এক সাহাবি তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন।
রক্ত-বালিতে তড়পাচ্ছিল তার দেহ। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর উত্তোলিত তরবারি নেমে এল আবু জাহালের গর্দান বরাবর। পরক্ষণেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তার শির দেহ হতে।
হজরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ সগর্বে তা পেশ করলেন রাসুলে আরাবির কদম মুবারকে।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জাহেলের কর্তিত শির দেখে স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে বললেন :
সেই মহান সত্তার প্রশংসা, যিনি তোকে লাঞ্ছিত করেছেন।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বললেন—
আজ এই উম্মতের ফিরাউনের মৃত্যু ঘটল।
বদর যুদ্ধক্ষেত্রই শুধু নয়, তাঁর শৌর্য-বীর্য দেখেছে উহুদ, খন্দক ও খায়বারও। সঙ্গী ছিলেন প্রিয় নবীর- হুদাইবিয়া ও মক্কা বিজয়েও।

৯.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাসনামলে তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পর হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে কুফার গর্ভনর নিযুক্ত করেন। সেখানকার অর্থ ও শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর হাতে অর্পণ করেন। তিনি দশ বছর পর্যন্ত—সুচারুরূপে এ দায়িত্ব পালন করেন এবং হজরত উসমান রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফত আমলে এ দায়িত্ব থেকে অবসর নেন। এরপর তিনি রওনা হন বাইতুল্লাহর সফরে।
আল্লাহ তাআলা পূরণ করেন তাঁর এ বাসনাও।
পালন করেন পবিত্র হজ।
পরিশেষে ৬০ বছর বয়সে ৩২ হিজরিতে তিনি চির বিদায় নেন এই জগত-সংসার হতে।
ফুলের চেয়েও সুন্দর সুরভিত ছিল তাঁর জীবন!
তাঁর মৃত্যুও ছিল সুন্দর!
রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

হজরত উসমান রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর জানাজা নামাজ পড়ান।
হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেন :
আবদুল্লাহ এমন একটি পাত্র, যাঁর পুরোটাই ছিল ইলমে পরিপূর্ণ।
সুবাহানাল্লাহ!

—আরশাদ ইকবাল